শিক্ষা মন্ত্রণালয়

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সহনক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত মাধ্যমিক শিক্ষক ম্যানুয়াল

লার্নিং এক্সিলারেশন ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন (LAISE) প্রজেক্ট

সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১	ভূমিকা	০১
২	বৈশ্বিক ও বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে জলবায়ু পরিবর্তন	০৪
৩	ম্যানুয়েলটি প্রণয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	০৪
৪	ম্যানুয়াল ব্যবহারকারী	০৫
৫	অংশীজন	০৫
৬	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব	০৫
৭	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের তীব্রতা অনুসারে অঞ্চল বিভাজন	০৯
৮	জলবায়ু সহনক্ষমতা বৃদ্ধি	১০
৯	স্কুল সেফটি পরিকল্পনা	১৬
১০	শিক্ষায় জলবায়ু সহনক্ষমতা এবং অভিযোজনের জন্য অভিভাবক-সামাজিক কমিউনিটির ভূমিকা	১৯
১২	জলবায়ু পরিবর্তনে মানসিক স্বাস্থ্যের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় সহনক্ষমতা বৃদ্ধির নির্দেশিকাসমূহ	২০
	সংযুক্তি-১: বিদ্যালয় নির্বাচন মানদন্ড	২৪
	সংযুক্তি-২: বিদ্যালয়ে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব ও সহনক্ষমতার কার্যকারিতা পরিমাপের লক্ষ্যে পরীবিক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া:	২৫
	সংযুক্তি-৩: ম্যানুয়ালে ব্যবহৃত জলবায়ু সংক্রান্ত প্রযুক্তিগত পরিভাষা	৩০

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সহনক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত মাধ্যমিক শিক্ষক ম্যানুয়াল

১. ভূমিকা:

বর্তমান পৃথিবীতে জলবায়ু পরিবর্তন একটি বহূল আলোচিত বিষয়। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব বর্তমান এবং আগামীর পৃথিবীর স্থিতিশীলতা হুমকির মুখে ফেলে দিচ্ছে। এটি একবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ, যা সরাসরি প্রকৃতি, সমাজ এবং অর্থনীতির উপর প্রভাব ফেলছে। বিষয়টির গুরুত্ব অনুভব করে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ ২০১৫ সালে ফ্রান্সের প্যারিসে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। এর ফলশ্রুতিতে ২০২১ সালে প্যারিস জলবায়ু চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যার মূল লক্ষ্য ছিল পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পূর্বের তুলনায় ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে রাখা, যদি সম্ভব হয় তাহলে তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে সীমাবদ্ধ রাখা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় পৃথিবীর দেশগুলোকে সাহায্য করা। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত, জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন কনভেনশনের (UNFCCC) ১৯৫টি সদস্য দেশ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করে, যার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। জলবায়ু পরিবর্তনের এই বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় বাংলাদেশের মাধ্যমিক পর্য়ায়ের শিক্ষার্থীদের পরিবেশন সচেতন নাগরিক হিসেবে তৈরি করা প্রয়োজন। এর অংশ হিসেবে বাংলাদেশের মাধ্যমিক পর্য়ায়ের শিক্ষকদের জলবায়ু বিষয়ক সচেতনতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব জনিত সহনক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সহনক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত মাধ্যমিক শিক্ষক ম্যানুয়াল তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আশা করা যায়, এই উদ্যোগ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বর্তমান ও আগামী দিনের শিক্ষার্থীদের জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে। জলবায়ু পরিবর্তন এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিষয়টি আলোচনার পূর্বে জলবায়ু সম্পর্কিত নিম্নোক্ত মৌলিক বিষয়সমূহ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ধারণা থাকা প্রয়োজন।

জলবায়ু পরিবর্তন কি?

কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় কোনো নির্দিষ্ট সময়ে বায়ুমন্ডলের পরিস্থিতিই হল আবহাওয়া। বাতাসের উষ্ণতা, আর্দ্রতা, বায়ু চাপ, বায়ুপ্রবাহ, মেঘ-বৃষ্টির পরিসংখ্যান দিয়ে আবহাওয়ার পরিস্থিতি বোঝানো হয়। আর কোনো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের বহু বছরের আবহাওয়ার গড় অবস্থাকে বলা হয় জলবায়ু। সাম্প্রতিক সময়ে পৃথিবীতে আলোচিত বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম প্রধান বিষয় হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন। আর জলবায়ু পরিবর্তন বলতে ৩০ বছর বা তার বেশি সময়ে কোনো জায়গার গড় জলবায়ুর দীর্ঘমেয়াদী ও অর্থপূর্ণ পরিবর্তন তথা একটি নির্দিষ্ট এলাকার তাপমাত্রা বা বৃষ্টিপাতের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনকে বোঝায়।

জলবায়ু পরিবর্তন কেন হয়?

গবেষণা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বলা যায় প্রকৃতির প্রতি মানুষের বিরূপ আচরণের কারণে জলবায়ু পরিবর্তন হলেও প্রাকৃতিক কারণেও স্বাভাবিকভাবে জলবায়ুতে কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়। যেমনঃ পৃথিবীর বিভিন্ন গতিশীল প্রক্রিয়া, সৌর বিকিরণের মাত্রা, পৃথিবীর অক্ষরেখার দিক-পরিবর্তন ইত্যাদি। মূলত বায়ুমন্ডলে ছড়িয়ে পড়া কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস পৃথিবীর তাপমাত্রাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে, তথা জলবায়ু পরিবর্তনে ভূমিকা রাখছে। কল-কারখানা ও যানবাহন থেকে নিঃসারিত বিষাক্ত কালো ধোঁয়া, বনাঞ্চল ধংসের ফলে বায়ুমন্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসের মাত্রা বৃদ্ধিপাচ্ছে যা প্রকারান্তরে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রাকে বাড়িয়ে জলবায়ু পরিবর্তনে অন্যতম ভুমিকা রাখছে। জলবায়ু পরিবর্তনের স্বরূপ বুঝতে হলে গ্রীন হাউস প্রভাব সর্ম্পকে ধারণা থাকা প্রয়োজন।

গ্রিন হাউস প্রভাব:

বায়ুমন্ডল পৃথিবীর তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করে। এই ক্ষেত্রে বায়ুমন্ডলের নিম্ন স্তরে কিছু গ্যাস গ্রিন হাউস বা কাচের ঘরের দেওয়াল বা ছাদের মতো কাজ করে। সূর্যের আলো পৃথিবীর তাপ ও শক্তির মূলউৎস। সূর্যরশ্মি বায়ুমন্ডলে এসব গ্যাসীয় স্তর ভেদ করে পৃথিবীতে এসে পড়ে। পৃথিবীতে আসা সূর্যালোকের সবটুকু কাজে লাগে না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সূর্যালোক ভূপৃষ্ঠে ছেড়ে দেয়। আবার ভূপৃষ্ঠ থেকে বিকিরণ তাপের সবটুকু মহাশূন্যে চলে যায় না। এই বিকিরিত তাপের একাংশ প্রধানত কার্বন ডাই-অক্সাইড জলীয় বাষ্প এবং অন্যান্য গ্রিন হাউস গ্যাস দ্বারা শোষিত হয়ে আবহাওয়া মন্ডলে কতটুকু থেকে যায় তা নির্ভর করে গ্রিন হাউস গ্যাসের ওপর। এসব গ্রিন হাউস গ্যাস বিকিরিত তাপকে মহাশূন্যে ফিরে যেতে বাধা প্রদান করে। সুতরাং গ্রিন হাউস গ্যাসসমূহের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে বায়ুমন্ডলের তাপ ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং বিশ্ব উষ্ণায়নের দিকে ধাবিত হবে মূলত উষ্ণতা বৃদ্ধির এই প্রক্রিয়াকে গ্রিন হাউস প্রভাব বলে।

গ্রিনহাউজ প্রভাব

গ্রিন হাউস প্রভাবের জন্য দায়ী গ্যাসসমূহ:

গ্রিন হাউস প্রভাবের জন্য দায়ী গ্যাসসমূহ হলো- কার্বন ডাই-অক্সাইড - ৫০%, কৃত্রিমভাবে তৈরি ক্লোরোফ্লোরো কার্বন - ১৭%, নাইট্রাস অক্সাইড - ৪%, ওজোন - ৮% এবং জলীয়বাষ্প - ২%

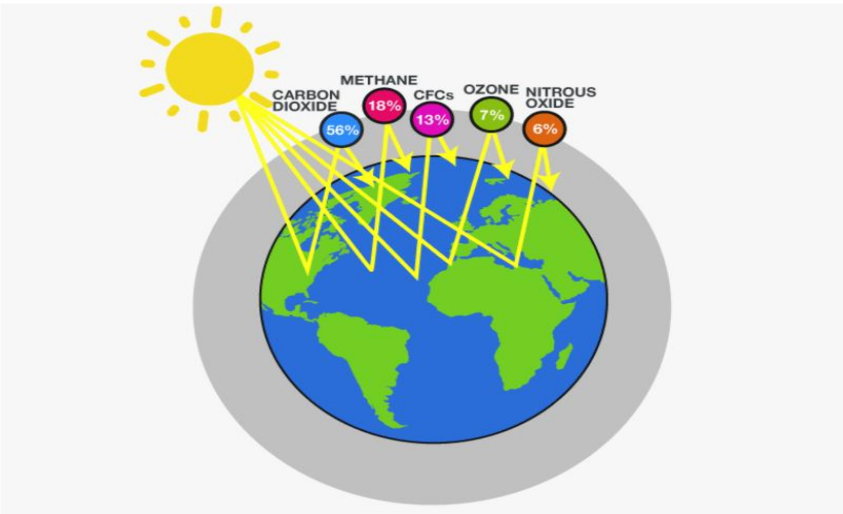

২. বৈশ্বিক ও বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে জলবায়ু পরিবর্তন:

প্রতিকূল ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। ব্রিটিশ গবেষণা সংস্থা ম্যাপলক্র্যাফ্ট-এর তালিকায়, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ঝুঁকিপূর্ণ ১৫ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সবার আগে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে দেশের ষড়ঋতুর চক্রকাল বিলম্বিত বা পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা, অতিরিক্ত শৈত্য প্রবাহ, খরা, তাপদাহ, নদীভাঙন, আগাম বন্যা, বজ্রপাত, অস্বাভাবিক বৃষ্টিপাত, ভূগর্ভস্থ পানির অবনমন, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ ইত্যাদি দুর্যোগের প্রাদুর্ভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা দেশের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করছে। বিশেষকরে, এসকল দুর্যোগ প্রান্তিক পরিবারসমূহের জীবন-জীবিকায় মারাত্মক প্রভাব ফেলছে এবং শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রমকেও উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করছে। এতে শিশুরাই সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে পড়ছে। তারা শিক্ষা থেকে ঝরে পড়ছে, শিশুশ্রমের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে, এবং স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পানি, বায়ু ও জীবাণুবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব বেড়ে যাচ্ছে।

একটি গবেষণা মতে, ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের তাপমাত্রা গড়ে ১.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং ২১০০ সাল নাগাদ ২.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ২০৫০ সাল নাগাদ খরায় উদ্বাস্তু হবে প্রায় ৮০ লাখ মানুষ। ইউনেসকোর 'জলবায়ুর পরিবর্তন ও বিশ্ব ঐতিহ্যের পাঠ' শীর্ষক প্রতিবেদনের তথ্যমতে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিসহ বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের বিভিন্ন কারণে সুন্দরবনের ৭৫ শতাংশ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। উপকূলীয় এলাকায় বর্ধিত হারে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বিপুল সংখ্যক অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু আশ্রয় নিচ্ছে নিকটবর্তী বড় শহরগুলোয় কিংবা রাজধানী শহরে, যা আর্থ-সামাজিক পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে।

৩. ম্যানুয়েলটি প্রণয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

লক্ষ্য:

বাংলাদেশের মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে জলবায়ু পরিবর্তনের রিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় জ্ঞান শিক্ষা সমাজ গড়ে তোলা।

কৌশলগত উদ্দেশ্য:

৩.১ বর্তমান এবং আগামী দিনের শিক্ষার্থীদের জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু হিসেবে গড়ে তোলা।

৩.২. জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শিক্ষার্থীদের মানসিক, শারীরিক এবং সামাজিক হিসেবে গড়ে তোলা।

৩.৩ শিক্ষক, শিক্ষার্থীসহ ম্যানুয়াল ব্যবহারকারীদের জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে অভিযোজন এবং সহনক্ষমতা গড়ে তোলা।

৪. ম্যানুয়াল ব্যবহারকারী (Intended Audience): মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ মোকাবেলা সংক্রান্ত এই ম্যানুয়ালের প্রত্যক্ষ ব্যবহারকারী হলেন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক এবং পরোক্ষ ব্যবহারকারী হলেন শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও এলাকবাসী।

৫. অংশীজন (Stakeholder):

মাধ্যমিক স্তরের সংশ্লিষ্ট শিক্ষক এবং পরিবেশের স্থিতিশীলতা রক্ষায় জড়িত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যাক্তিবর্গ।

৬. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব:

৬.১ বৈশ্বিক উষ্ণায়ন: জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকির মূলে রয়েছে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন (Global Warming)। এর ফলে আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদানসমূহে পরিবর্তন দেখা দেয়, হিমবাহের বরফ গলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। পৃথিবীর সর্বত্র প্রাকৃতিক, সামাজিক ও অর্থৈনৈতিকসহ জনজীবন ও জীবিকার উপর এর প্রভাব পড়ে। বাংলাদেশের অবস্থা সম্পর্কে Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP), ২০০৯ এর রিপোর্টে নিম্নবর্ণিত আশঙ্কা ব্যক্ত করা হয়েছে :

- ক্রমবর্ধমান ঘূর্ণিঝড়ের সাথে ঝড়ো হাওয়া ও জলোচ্ছাস উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে পূর্বের তুলনায় অধিক ক্ষতি সাধন করবে;
- বর্ষাকালে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা অববাহিকা অঞ্চলে পূর্বের চেয়ে অধিক ভারি বর্ষণ ও অস্বাভাবিক বৃষ্টিপাত ঘটবে। ফলে, বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বন্যা হবে, বাঁধগুলো ক্ষতিগ্রস্থ হবে, নদীভাঙ্গান ঘটবে, বাড়ি ঘর ও চাষের জমি নদীগর্ভে যাবে, নদীতে পলি জমে নাব্যতা কমবে ও জলাবদ্ধতা দেখা দিবে;
- হিমালয়ের বরফ গলনের ফলে বছরের উষ্ণতম মাসগুলোতে নদীতে জলপ্রবাহ বেড়ে যেয়ে বন্যা হবে এবং বরফ গলন শেষ হলে প্রবাহ কমে যাবে ও লবনাক্ততা বৃদ্ধি পাবে। ফলে সুপেয় পানির অভাব দেখা দিবে ও সুন্দরবন ক্ষতিগ্রস্থ হবে;
- দেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে কম বৃষ্টিপাতের কারণে খরা দেখা দিবে, কৃষির উপর বিরূপ প্রভাব পড়বে;
- উষ্ণতর ও অধিক আর্দ্রতার কারণে রোগব্যাধির প্রকার ও সংক্রমণ বৃদ্ধি পাবে।

৬.২ প্রাকৃতিক দুর্যোগের তীব্রতা বৃদ্ধি:

বন্যা: বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে হিমবাহ গলন ও ক্রান্তীয় মৌসুমী অঞ্চলে অধিক বৃষ্টিপাতের ফলে বন্যার পৌনঃপুনিকতা ও তীব্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ছাড়াও বাংলাদেশের ৫৪ টি আন্তঃদেশীয় নদীর গতিপথে উজানে বাঁধ নির্মাণের ফলে নদীর স্বাভাবিক গতি বিঘ্নিত হয়ে বছরে একাধিকবার ভয়াবহ বন্যা হয়েছে, যেমন ১৯৭৪ সালের পর ১৪ বছরের ব্যবধানে ১৯৮৮ সালে এবং ১০ বছর ব্যবধানে ১৯৯৮ সালে বন্যা হয়েছিলো। এরপর ৬ বছর

ব্যবধানে ২০০৪ সালে ও ৩ বছর ব্যবধানে ২০০৭ সালে বন্যা হয়েছে। পরবর্তীতে ১০ বছর পর ২০১৭ সালে ও পরে ২০২২ ও ২০২৪ সালে বন্যা হয়েছে, যা জনজীবনে ব্যাপক ক্ষতি সাধন করেছে।

নদী ভাঙ্গন: বাংলাদেশে বর্ষার মৌসুমে ভারি বর্ষণের কারণে নদী প্রবাহ বেড়ে যায় ও পাশাপাশি বন্যার ফলে নদী ভাঙনের হারও বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন স্যাটেলাইটের অনুসন্ধানে নদী ভাঙ্গনের ফলে নদীর গতি প্রবাহের পরিবর্তনের চিত্র ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। এ দুর্যোগের কবলে পড়ে এদেশের বহু মানুষ তাদের ঘর-বাড়ি, ধন-সম্পদ হারিয়ে উদ্বাস্তু জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে।

ঘূর্ণিঝড়: বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা এবং সংঘটনের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, যেমন ২০০৭ সালে সিডর, ২০০৯ সালের আইলা, ২০১৩ সালে মহাসেন, ২০২০ সালে আম্পান, ২০২৪ সালে রেমাল ইত্যাদি। অথচ ১৯৭০-২০০০ সালের মধ্যে কেবল ৪টি বড় ধরনের ঘূর্ণিঝড় হয়েছে।

খরা: জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ায় শুষ্ক মৌসুমে স্বল্প বৃষ্টিপাত সম্পন্ন এলাকাগুলোতে খরার সৃষ্টি হয়। দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও বরেন্দ্র এলাকা খরাপ্রবণ অঞ্চল হিসেবে পরিচিত। বিশেষ করে রাজশাহী, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, নওগাঁ, দিনাজপুর, বগুড়া ও কুষ্টিয়া জেলায় খরা দেখা যায়।

বজ্রপাত: বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে বায়ুমন্ডলে তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে,যা বজ্রপাতের সংখ্যা ও তীব্রতা বাড়িয়ে তুলছে। ২০১৬ সালে বজ্রপাতকে প্রাকৃতিক দূর্যোগ হিসাবে ঘোষণা করা হয়।

তাপদাহ: আবহাওয়া বিষয়ক বৈশ্বিক সংস্থা ওয়ার্ল্ড মেটেরোলিজক্যাল অর্গানাইজেশন (ডব্লিউএমও) এক প্রতিবেদনে তাপদাহের তীব্রতার কারণ হিসেবে মূলত জলবায়ু পরিবর্তনকেই দায়ী করেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে বৈশ্বিক গড়ের চেয়ে দ্রুত উষ্ণ হচ্ছে এশিয়া মহাদেশের দেশগুলো।

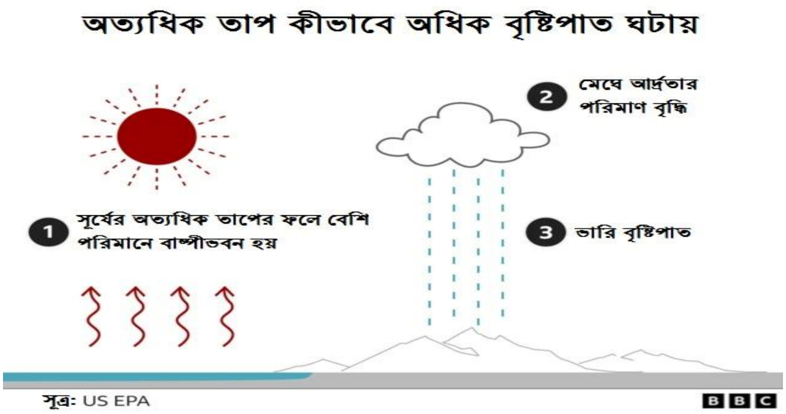

সূত্র: জলবায়ু পরিবর্তন কীভাবে তাপদাহ খরা, দাবানল ও বন্যার তীব্রতা বাড়ায়, Mark Poynting and Esme Stallard, BBC News Climate & Science, ১৪ November ২০২৪

৬.৩. কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা ঝুঁকি বৃদ্ধি:

ফসল উৎপাদন হ্রাস : তাপমাত্রা বৃদ্ধি, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, লবণাক্ততা ও খরার কারণে ধান ও অন্যান্য ফসলের উৎপাদন কমছে। আবার ফসল কাটার সময় অতিরাক্ত বৃষ্টিপাতের ফলে বন্যার সৃষ্টি হয়, যা ফসল উৎপাদন হ্রাসের কারণ।

মৎস্যসম্পদ ক্ষতি: গ্রীষ্মকালে নদী প্রবাহ কমে যাওয়ায় লবনাক্ত পানি দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে মাছের প্রজনন হ্রাস পায়। অনেক প্রজাতির মাছ বিপন্ন হয়ে যাচ্ছে যা জীববৈচিত্রের ভারসাম্য বিনষ্ট করে খাদ্য নিরাপত্তাকে বাধাগ্রস্থ করছে।

ঘ. উপকূলীয় এলাকার লবণাক্ততা বৃদ্ধি:

- সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও শুষ্ক মৌসুমে নদী প্রবাহ হ্রাস পাওয়ার কারণে উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততা বেড়ে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে।
- লবনাক্ততার কারণে মিঠা পানির উৎসগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে বিশুদ্ধ পানির সংকট সৃষ্টি হচ্ছে।
- সন্দরবনের মতো বনাঞ্চলে লবণাক্ততার কারণে ম্যানগ্রোভ ও বন্যপ্রাণীর জীবনধারা হুমকির মুখে পড়েছে।

ঙ. মাটির উর্বরতা হ্রাস:

- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের মাটিতে অম্লতা বৃদ্ধি ফসল উৎপাদনে বিরূপ প্রভাব ফেলে। ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে মাটির পুষ্টি উপাদান কমে যায় ও উর্বরতা হ্রাস পায়।
- জলবায়ু পরিবর্তন মাটির জৈব পদার্থ কমিয়ে দেয়, মাটির গঠনকে ক্ষতিগ্রস্থ করে, যা মাটির ধারণক্ষমতা কমিয়ে বন্যার ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়।

চ. জনস্বাস্থ্য সমস্যা:

- **পানিবাহিত রোগ:** বন্যা, জলাবদ্ধতা এবং লবণাক্ত পানির কারণে ডায়রিয়া, কলেরা, টাইফয়েড ও ত্বকের রোগ বাড়ছে।

- **বায়ুবাহিত রোগ:** বায়ু দূষণের ফলে ফুসফুস ও শ্বাসকষ্টজনিত রোগ যেমন-হাঁপানি, ব্রংকাইটিস ও আনুষঙ্গিক রোগব্যাধি বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- **ভেক্টর অনুজীববাহিত রোগ:** ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, চিকনগুনিয়া ও কালাজ্বর ইত্যাদি রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- **তাপপ্রবাহ:** তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে হিট স্ট্রোক এবং হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ছে।
- **মানসিক স্বাস্থ্য:** জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মানুষ মানসিক চাপ, রাগ, উদ্বেগ, মানসিক ক্লান্তি, আত্মহত্যার প্রবণতা, পোষ্ট-ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার এবং হতাশার সম্মুখীন হচ্ছে।
- **পুষ্টিহীনতা:** কৃষি উৎপাদন কমে যাওয়ায় খাদ্য নিরাপত্তা হ্রাস ও পুষ্টিহীনতা বৃদ্ধি পায়। ফলে স্বাস্থ্যগত দূর্বলতার কারণে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়।
- **নারীর শারিরীক স্বাস্থ্য:** জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মিঠা পানির অপ্রতুলতার ফলে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে পারেনা বিধায় উপকূলীয় এলাকার নারীরা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় আশ্রয়কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সুযোগের অভাবে আক্রান্ত পরিবারের নারীরা পিলের মাধ্যমে ঋতুচক্র ব্যাহত করে, যা মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণ।

ছ. বাস্তুচ্যুত জনসংখ্যা:

বন্যা, নদীভাঙন ও ঘূর্ণিঝড়ের কারণে লাখ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়ে শহরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছে। ফলে শহরাঞ্চলে অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সৃষ্ট দুর্যোগের ফলে বাস্ত্যুচ্যুতির তালিকায় এশিয়ায় বাংলাদেশ পঞ্চম স্থানে অবস্থান করছে। আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা International Organization for Migration (IOM) এর ওয়ার্ল্ড মাইগ্রেশন রিপোর্ট ২০২৪ এ তথ্য অনুসারে শুধুমাত্র ২০২২ সালেই বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাংলাদেশে ১৫ লাখের বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। এ ধরনের বাস্তুচ্যুত জনসংখ্যাকে জলবায়ু উদ্বাস্তু নামেও অভিহিত করা হয়।

জ. জীববৈচিত্র্যের হমকি: সুন্দরবনের মতো অন্যান্য ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলে লবণাক্ততার কারণে ম্যানগ্রোভ ও বন্যপ্রাণীর জীবনধারা হুমকির মুখে। মানুষের অনিয়ন্ত্রিত কর্মকান্ডের ফলে (বন উজাড়, পশু শিকার ও হত্যা, প্রাণীর আবাসভূমি ধ্বংস) জীববেচিত্র্য দিনে দিনে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

ঝ. শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রভাব: জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগের তীব্রতা ও পৌনঃপুনিকতা বৃদ্ধির কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো দীর্ঘদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, ফলে পাঠদান ও পরীক্ষা স্থগিত হচ্ছে এবং শিক্ষার মান হ্রাস পাচ্ছে।

ঞ. অর্থনৈতিক খাত:

- **জীবিকা হ্রাস ও পেশার পরিবর্তন:** কৃষি, মৎস্য এবং পশুপালন খাতের উপর নির্ভরশীল মানুষ তাদের জীবিকা হারাচ্ছে।
- **বেকারত্ব বৃদ্ধি:** জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি কঠিন হয়ে পড়ছে।

৭. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের তীব্রতা অনুসারে অঞ্চল বিভাজন:

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে যে প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, তার উপর ভিত্তি করে **''বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০''** অনুসারে বাংলাদেশকে কতগুলো অঞ্চল ভিত্তিক **জলবায়ুজনিত ঝুঁকিপ্রবণ হটস্পট হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন-**

সূত্র: বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বিশ্লেষণ, জিইডি, ২০১৫ এবং উপকূলীয় অঞ্চল নীতিমালা ২০০৫

প্রতিটি হটস্পটের সমস্যা সমূহ:

ক্রমিক	অঞ্চলের নাম	জেলার নাম	জলবায়ু সম্পর্কিত সমস্যা
১.	উপকূলীয় অঞ্চল (১৯টি জেলা)	বাগেরহাট, বরগুনা, বরিশাল, ভোলা, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ফেনী, গোপালগঞ্জ, যশোর. ঝালকাঠী, খুলনা, লক্ষ্মীপুর, নড়াইল, নোয়াখালী, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, সাতক্ষীরা ও শরিয়তপুর	ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছাসের প্রভাব, বন্যা, লবণাক্ততা, নদী ও উপকূলীয় ভাঙন, মিষ্টি পানির অপ্রাপ্যতা
২.	বরেন্দ্র এবং খরাপ্রবণ অঞ্চল (১৮টি জেলা)	বগুড়া, চুয়াডাঙ্গা, দিনাজপুর, গাইবান্ধা, জয়পুরহাট, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, নওগাঁ, নাটোর, চাপাইনবাবগঞ্জ, নীলফামারী, পাবনা, পঞ্চগড়, রাজশাহী, রংপুর, সাতক্ষীরা, সিরাজগঞ্জ ও ঠাকুরগাঁও	মিষ্টি পানির সংকট, ভূগর্ভস্থ পানির স্তর হ্রাস, খরাপ্রবণ এলাকায় সেচের অভাব, কৃষি উৎপাদনে ব্যাঘাত
৩.	হাওর এবং আকস্মিক প্লাবনপ্রবণ অঞ্চল (৭টি জেলা)	ব্রাহ্মণবাড়িয়া, হবিগঞ্জ, সিলেট, নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও সুনামগঞ্জ	মিষ্টি পানির প্রাপ্যতা কমে যাওয়া, মৌসুমি বন্যা, ভূমি ক্ষয়, জীববৈচিত্র্য হ্রাস

ক্রমিক	অঞ্চলের নাম	জেলার নাম	জলবায়ু সম্পর্কিত সমস্যা
৪.	পাহাড়ি এবং চট্টগ্রাম অঞ্চল (৩টি জেলা)	বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি	মিষ্টি পানির ঘাটতি, ভূমি ক্ষয় এবং ভূমিধ্বস, জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণে ঘাটতি, সেচ ব্যবস্থা ও পানির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাব
৫.	নদী অঞ্চল এবং মোহনা (২৯টি জেলা)	বরগুনা, বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী, বগুড়া, চাঁদপুর, কুমিল্লা, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী, ফরিদপুর, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, মুন্সিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, নাটোর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, শরিয়তপুর, টাঙ্গাইল, জামালপুর ও খুলনা	নদীর ভাঙন, পানির প্রবাহের হ্রাস, পানির দূষণ, নতুন ভূমির গঠন ও তার যথাযথ ব্যবহার
৬.	নগরাঞ্চল (৭টি জেলা)	বরিশাল, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, ঢাকা, খুলনা, রংপুর ও সিলেট	পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার অবনতি, মিষ্টি পানির সরবরাহের সীমাবদ্ধতা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অভাব, ভূমি দখল এবং নগরায়ণের সমস্যা

৮. জলবায়ু সহনক্ষমতা বৃদ্ধি (Climate Resilience Building):

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সহনক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কৌশল/পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে:

ক. দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ (Disaster Risk Reduction - DRR)

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করার ক্ষেত্রে **মাধ্যমিক শিক্ষার** ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের মতো একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যদি কার্যকরভাবে সচেতনতা ও প্রস্তুতি গড়ে তোলা যায়, তবে তা সমাজের প্রতিটি স্তরে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে মাধ্যমিক শিক্ষায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিতে হবে:

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা প্রদান ও অনুশীলন

- মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের দুর্যোগ চক্র ও এর কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা প্রদান করতে হবে। পাশাপাশি দুর্যোগ চক্রে প্রতিটি কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

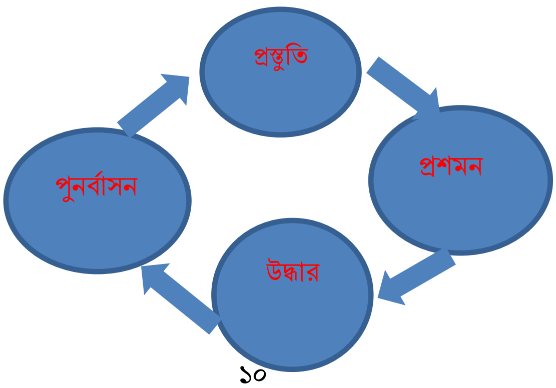

চিত্র: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা চক্র

ii. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়টি শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্তি

- মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে **দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস** এবং **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা** সম্পর্কিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে কলেবর কিছুটা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এই বিষয়গুলো ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে দুর্যোগের প্রাথমিক ধারণা সৃষ্টি করবে এবং কীভাবে তা মোকাবেলা করতে হয়, তা শেখাবে। যেমন:
- **ক). প্রাথমিক চিকিৎসা ও উদ্ধার কাজের প্রশিক্ষণ**: শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক চিকিৎসা, দুর্ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার এবং উদ্ধারকাজের সহজ কৌশল শেখানো যেতে পারে। এটি তাদের দুর্যোগের সময় দ্রুত সহায়তা প্রদান করতে সক্ষম করে তুলবে ।
- **খ). আবহাওয়া পূর্বাভাস ও বিপদ সংকেত**: পাঠ্যপুস্তকে **আবহাওয়া পূর্বাভাস ও বিপদ সংকেত ও** প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কিত তথ্যাদি অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের অবহিত করা প্রয়োজন।

শিক্ষাক্রমে সহশিক্ষা কার্যক্রমে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। যেমন:

- **মাঠপর্যায়ে কার্যক্রম**: ছাত্র-ছাত্রীদের মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করানো যেতে পারে, যেমন বৃক্ষ রোপণ, নদী বা বাঁধের রক্ষণাবেক্ষণ এবং সাইক্লোন শেল্টার সেন্টার পরিদর্শন।
- **কমিউনিটি ভিত্তিক প্রচারণা**: ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের পরিবার ও সম্প্রদায়ে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন পরিচালনা করতে পারে।

iii. প্রাকৃতিক সম্পদের সুরক্ষা ও টেকসই উন্নয়নে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ:

- মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের মধ্যে **প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা** এবং **টেকসই উন্নয়ন** সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা। বৃক্ষ রোপণ, পরিবেশ দূষণ কমানো;
- শিক্ষার্থীদের জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার কমানোর উপায় এবং পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার শেখানো;
- সৌর শক্তি, বায়ু শক্তি, জলবিদ্যুৎ ইত্যাদি নবায়নযোগ্য শক্তি উৎস ব্যবহার করা।

iv. স্মার্ট স্কুল ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা

- মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোকে **স্মার্ট স্কুল** হিসেবে গড়ে তোলা, যেখানে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেমন দুর্যোগ সতর্কীকরণ সিস্টেম, সিসিটিভি, নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্র ইত্যাদি।
- স্কুল ভবনগুলোর নকশায় ভূমিকম্প এবং বন্যার প্রভাব সহ্য করার সক্ষমতা নিশ্চিত করা।

v. স্টুডেন্টস ক্লাব ও সামাজিক আন্দোলন:

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিবেশভিত্তিক ক্লাব তৈরি এবং রেডক্রিসেন্ট/ স্কাউট/গার্লগাইড এর ইউনিট যেতে পারে।
- শিক্ষার্থীরা ক্লাবের মাধ্যমে বা সামাজিক আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়ে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে পারে। যেমন: "Climate Strike" বা "Green Schools" ইত্যাদি।
- কমিউনিটি লেভেলে শিক্ষার্থীদের ট্যুরের-ব্যবস্থা-করা যেতে পারে, যাতে তারা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মানুষের উপর কীভাবে পড়ছে সে সম্পর্কে বাস্তবসম্মত জ্ঞানলাভ করতে পারে।
- ঝুঁকি ও সক্ষমতার প্রেক্ষিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে গ্রেডিং করা, জলবায়ু সংক্রান্ত দিবস পালন, ব্যানার ফেস্টুন, নাটক-সিনেমা প্রদর্শন, লিফলেট বিতরণ এর মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- বৃক্ষরোপণ এবং বনভূমির সংরক্ষণে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;

খ. জলবায়ু অভিযোজন:

নিম্নবর্ণিত প্রশমন ও অভিযোজন পদ্ধতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে জলবায়ু সহনক্ষমতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে:

i. **শক্তি ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন:** অংশীজনদের শক্তি ব্যবহারের দক্ষতা সম্পর্কিত ধারণার সাথে সম্পৃক্ত করা যেমন-

- প্রাকৃতিক বায়ু চলাচল ও আলো নিরোধক ছাদ ইত্যাদি ব্যবহারে উৎসাহিত করা;
- এলইডি বাতি, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী ডিভাইস ব্যবহারে উৎসাহিত করা;
- নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার, যেমন-সোলার প্যানেল, বায়োগ্যাস ইত্যাদি ব্যবহার;
- বিদ্যুত সাশ্রয়ের লক্ষ্যে ব্যবহারের পর বাতি, ফ্যান বন্ধ করার অভ্যাস তৈরি করা;
- ভবনের চারপাশে গাছ লাগিয়ে ঘরের তাপমাত্রা কমানোর মাধ্যমে বিদ্যুৎ সাশ্রয় করা এবং সবুজ ক্যাম্পসের ধারণা প্রচার;

ii. **বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ:**

- শিক্ষার্থীদের কাছে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা;
- পানির অপচয় রোধ করতে উৎসাহিত করা;
- "পানি আমার " সকলের মধ্যে এই বোধোদয় ঘটানো এবং
- নিম্নবর্ণিতভাবে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের পদ্ধতি ও ধারণা প্রদান করা:

বৃষ্টির পানি সংগ্রহ (Rainwater Harvesting) একটি পদ্ধতি, যার মাধ্যমে বৃষ্টির পানি সংগ্রহ করা হয় এবং পরবর্তীতে সেই পানি ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ করা হয়। এই পদ্ধতিটি মূলত পানির অভাব পূরণের জন্য এবং পরিবেশ সুরক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়। Rainwater Harvesting পদ্ধতির মূল পর্যায়গুলি হলো:

১.বৃষ্টির পানি সংগ্রহ:

এটি সাধারণত ছাদ বা অন্য কোনো খোলা স্থান থেকে বৃষ্টির পানি সংগ্রহ করে। ছাদে থাকা পানি সংগ্রহ করতে হয় বিশেষভাবে তৈরি করা পাইপের মাধ্যমে।

২.পানি পরিশোধন:

পানি সংগ্রহের পরে, তা ব্যবহারের উপযোগী করতে কিছুটা পরিশোধন করা হয়। এতে বিভিন্ন ধরনের পরিস্কারের প্রযুক্তি যেমন ফিল্টারিং সিস্টেম ব্যবহার করা হয়।

৩.পানি সংরক্ষণ:

পরিশোধিত পানি একটি ট্যাংক বা রিজার্ভারে সংরক্ষণ করা হয়, যাতে তা পরবর্তীতে কৃষি, গৃহস্থালি বা অন্যান্য প্রয়োজনের জন্য ব্যবহার করা যায়।

এভাবে বৃষ্টির পানি সংগ্রহের মাধ্যমে পানির অপচয় কমানো এবং পানি সঙ্কট মোকাবেলা করা সম্ভব। এটি পরিবেশ সংরক্ষণের একটি কার্যকর পদ্ধতি।

iii. বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা হলো বিভিন্ন ধরনের বর্জ্য বা অপচনশীল বস্তু সংগ্রহ, পরিবহন, প্রক্রিয়াকরণ, পুনঃব্যবহার এবং নিষ্কাশন করার একটি পদ্ধতি। এর উদ্দেশ্য হলো পরিবেশের গ্রীনহাউস নির্গমন হ্রাস ও সুস্থ, নিরাপদ এবং টেকসই উপায়ে বর্জ্যের পুনর্ব্যবহার নিশ্চিত করা।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মূল পদক্ষেপগুলি হল:

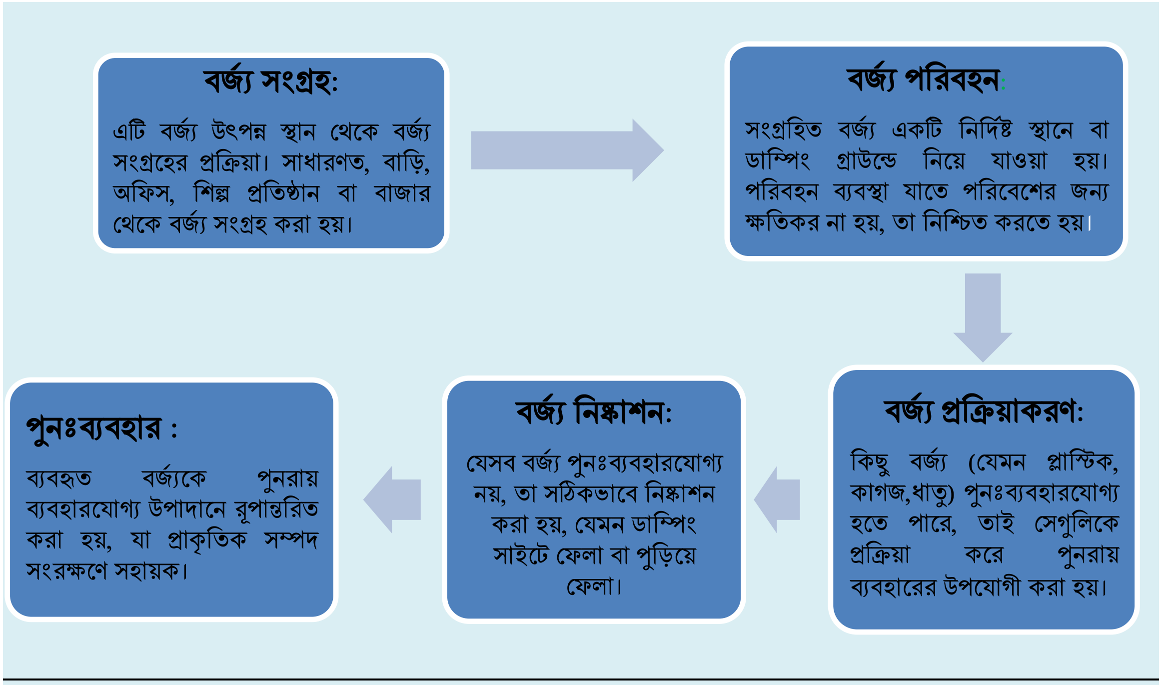

বাংলাদেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো টেকসই পরিবেশ তৈরির ক্ষেত্রে সচেতনতা বাড়াতে নিম্নলিখিতভাবে বিভিন্ন বর্জ্য হ্রাসের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

বর্জ্য পৃথকীকরণ ও পুনর্ব্যবহার

- জৈব, পুনর্ব্যবহারযোগ্য এবং অপুনর্ব্যবহারযোগ্য বর্জ্যের জন্য পৃথক বিন স্থাপন করা;
- কাগজ, প্লাস্টিক এবং ধাতব বর্জ্য পুনর্ব্যবহারের জন্য স্থানীয় পুনর্ব্যবহার কেন্দ্রগুলোর সাথে সমন্বয় করা এবং
- শিক্ষার্থী ও কর্মীদের সঠিক বর্জ্য পৃথকীকরণ সম্পর্কে সচেতন করতে “রিসাইক্লিং সচেতনতা অভিযান” আয়োজন করা।

কাগজের ব্যবহার কমানো

- প্রজেক্টর, ই-বুক এবং অনলাইন অ্যাসাইনমেন্টের মাধ্যমে ডিজিটাল শিক্ষাকে উৎসাহিত করা;
- দ্বিমুখী প্রিন্টিং এবং একপাশে প্রিন্ট করা কাগজ পুনরায় ব্যবহার করতে উৎসাহ প্রদান এবং
- শিক্ষার্থীদের পুরনো কাগজ থেকে নোটবুক বা শিল্পকর্ম তৈরি করতে উৎসাহ প্রদান করা;

কম্পোস্টিং

- খাদ্য অবশিষ্টাংশ, উদ্যানের বর্জ্য এবং পাতা ইত্যাদি জৈব বর্জ্যের জন্য কম্পোস্ট বিন স্থাপন করা এবং
- কম্পোস্ট ব্যবহার করে নিজ বাড়িতে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৃক্ষরোপন ও পরিপালনের উদ্যোগ গ্রহণ;

প্লাস্টিক বর্জ্য কমানো

- বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক (যেমন স্ট্র, প্লাস্টিক ব্যাগ, পানির বোতল) নিষিদ্ধ করা;
- শিক্ষার্থী ও কর্মীদের পুনর্ব্যবহারযোগ্য পানির বোতল, লাঞ্চ বক্স এবং ব্যাগ ব্যবহার করতে উৎসাহ প্রদান এবং
- শিক্ষার্থীদের প্লাস্টিক বর্জ্য থেকে নতুন উপকরণ তৈরি করার প্রক্রিয়া শেখাতে কর্মশালা আয়োজন করা।

হ্রাস, পুনর্ব্যবহার, পুনচক্রণ (3R) চর্চা উৎসাহিত করা

- **হ্রাস:** অপ্রয়োজনীয় কেনাকাটা এড়িয়ে চলা এবং দীর্ঘস্থায়ী পণ্য ব্যবহার করা।
- **পুনর্ব্যবহার:** পুরনো ইউনিফর্ম, পাঠ্যপুস্তক এবং আসবাবপত্র পুনরায় ব্যবহার করা।
- **পুনচক্রণ:** বর্জ্য উপকরণ থেকে নতুন পণ্য তৈরি করা (যেমন বর্জ্য কাঠ থেকে হস্তশিল্প বা আসবাবপত্র) ।

পরিবেশবান্ধব অনুষ্ঠান

- পুনর্ব্যবহারযোগ্য প্লেট ও কাপ ব্যবহার করে বর্জ্যহীন বিদ্যালয় অনুষ্ঠান আয়োজন করা;
- শিক্ষার্থীদের বর্জ্যহীন লাঞ্চবক্সের জন্য প্রণোদনা প্রদান এবং
- ফুল, পাতা ইত্যাদি প্রাকৃতিক উপকরণ দিয়ে অনুষ্ঠানের সাজসজ্জা করা।

শিক্ষামূলক প্রচারণা

- পাঠ্যক্রমে পরিবেশ শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করে বর্জ্য হ্রাস সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান;
- পরিবেশ বিষয়ক সেমিনার, কর্মশালা এবং কুইজ আয়োজন করে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করা এবং
- ধরিত্রী দিবস, বিশ্ব পরিবেশ দিবস ইত্যাদি উদ্‌যাপন করে পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা।

শিক্ষার্থী নেতৃত্বাধীন উদ্যোগ

- বর্জ্য হ্রাস উদ্যোগ পরিচালনা ও পর্যবেক্ষণের জন্য "ইকো ক্লাব" গঠন করা;
- উদ্ভাবনী বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ধারণার জন্য প্রতিযোগিতা আয়োজন এবং
- সঠিক বর্জ্য নিষ্পত্তি নিশ্চিত করতে প্রতিটি শ্রেণি থেকে "বর্জ্য মনিটর" নিয়োগ করা।

স্থানীয় সংস্থার সাথে অংশীদারিত্ব

- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে কাজ করা এনজিও এবং স্থানীয় সরকারি কর্মসূচির সাথে সমন্বয় করা এবং
- শিক্ষার্থীদের বৃহত্তর সম্প্রদায়ের সাথে যুক্ত করতে কমিউনিটি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অভিযানে অংশগ্রহণ।

পর্যবেক্ষণ ও জবাবদিহিতা

- মাসিক ভিত্তিতে উৎপন্ন বর্জ্যের পরিমাণ ট্র্যাক ও বিশ্লেষণ করে সমস্যা চিহ্নিত করা এবং
- বাস্তবসম্মত বর্জ্য হ্রাস লক্ষ্য নির্ধারণ এবং তা অর্জনে শিক্ষার্থী ও কর্মীদের পুরস্কৃত করা।

গ. প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালা

- শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ, সেমিনার এবং কর্মশালা আয়োজন করার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে এবং
- এসকল প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালায় অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস সংক্রান্ত শিক্ষণ এবং আলোচনা সেশন পরিচালনা করার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

ঘ. অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করা এবং
- রেড ক্রস বা অন্যান্য মানবিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।

এছাড়াও **সবুজ বিদ্যালয় ব্যবস্থা** সম্পর্কিত ধারণা প্রদান ও পরিবেশ অলিম্পিয়াড চর্চার মাধ্যমে সহনক্ষমতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

৯. স্কুল সেফটি পরিকল্পনা: স্কুলে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই মাস্টার প্ল্যানে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় স্কুলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সুরক্ষিত পরিবেশে শিক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। প্রতিটি স্কুল কর্তৃপক্ষ এলাকাভিত্তিক দুর্যোগ বিবেচনায় স্কুল সেফটি মাস্টার প্ল্যান অনুসরণপূর্বক তাদের স্কুলের জন্য প্রয়োজনীয় সেফটি গাইডলাইন প্রণয়ন করবে।

■ স্কুল সেফটির **পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ:**

প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
জরুরি অবস্থায় দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার ব্যবস্থা করা এবং
দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসন ও সহায়তা ব্যবস্থা তৈরি।

■প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা:

ভূমিকম্প	বন্যা	ঘূর্ণিঝড়	বজ্রপাত	অগ্নিকান্ড
স্কুল ভবন ভূমিকম্প প্রতিরোধী নকশায় তৈরি করা; ভূমিকম্পকালীন নিরাপদ আশ্রয়স্থল চিহ্নিত করা এবং	স্কুল চত্বরে পানিনিষ্কাশনের কার্যকর ব্যবস্থা নিশ্চিত করা; উঁচু স্থানে নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা এবং	শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় থেকে রক্ষার জন্য আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ; জানালা ও দরজাগুলো শক্ত করে বন্ধ রাখার ব্যবস্থা এবং	উঁচু গাছপালা ও বৈদ্যুতিক খুঁটি ও তার বা ধাতব খুটি, মোবাইল টাওয়ার ইত্যাদি থেকে দূরে থাকা; বজ্রপাতের সময় বাড়িতে থাকলে জানালার কাছাকাছি	আগুন লাগার কারণ এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ; নিয়মিত অগ্নিনির্বাপক ড্রিল পরিচালনা ও অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র স্থাপন ও ব্যবহার

শিক্ষার্থী ও শিক্ষককে "ড্রপ, কভার এবং হোল্ড অন" কৌশল শেখানো।	বন্যার সময় জরুরি খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ নিশ্চিত করা।	ঝড় চলাকালীন বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করার নির্দেশনা।	ও বারান্দায় অবস্থান না করা এবং জানালা বন্ধ রাখা; বজ্রপাতের সময় খোলা মাঠে অবস্থান না করা; বজ্রপাত ও ঝড়ের সময় বাড়ির ধাতব কল, সিঁড়ির ধাতব রেলিং, পাইপ ইত্যাদি স্পর্শ না করা এবং প্রতিটি বিল্ডিং-এ বজ্র নিরোধক দন্ড স্থাপন নিশ্চিত করা।	সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি।

■ জরুরি যোগাযোগ ব্যবস্থা

জরুরী সেবার হটলাইন নাম্বারসমূহ (এনএপিডি): দুর্যোগ প্রারম্ভিক সতর্কতা (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়) - ১০৯০; ১৬২৬৩ নম্বরে কল দিলেই ঘরের সামনে যাবে অ্যাম্বুলেন্স; ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি সার্ভিস - ৯৯৯. প্রতিটি ক্লাসরুমে জরুরি যোগাযোগ নম্বর সরবরাহ, অভিভাবকদের জন্য তথ্য প্রদানের দ্রুত ব্যবস্থা ও স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থার সাথে সমন্বয় করা জরুরি যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

■ সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণ

নিয়মিত দুর্যোগ সচেতনতা কর্মশালা আয়োজন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য শিক্ষক ও কর্মচারীদের বিশেষ প্রশিক্ষণ ও দুর্যোগকালীন করণীয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন করা যেতে পারে।

■ পুনর্বাসন ব্যবস্থা

ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের মানসিক সাপোর্ট প্রদান, শিক্ষার্থীদের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রম নেয়া যেতে পারে।

■ পর্যালোচনা এবং আপডেট

প্রতি বছর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনার কার্যকারিতা পর্যালোচনা এবং নতুন চ্যালেঞ্জ এবং দুর্যোগের ধরন অনুযায়ী পরিকল্পনা আপডেট করা যেতে পারে।

■ **স্কুল সেফটি কৌশল :** প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সেফটি মাস্টার প্ল্যান স্কুলের শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। সঠিক পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতার মাধ্যমে একটি সুরক্ষিত ও সহায়ক পরিবেশ গড়ে তোলা সম্ভব হবে। এছাড়াও বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একটি সুস্পষ্ট ও কার্যকর ইভাকুয়েশন পরিকল্পনা প্রয়োজন। নিচে বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের জন্য একটি স্কুল সেফটি গাইডলাইন প্রদান করা হলো:

প্রাথমিক প্রস্তুতি:

- **ঝুঁকি বিশ্লেষণ:** স্কুলের অবস্থান, পার্শ্ববর্তী নদী বা সমুদ্রের দূরত্ব এবং এলাকাটি বন্যা বা ঘূর্ণিঝড়প্রবণ কী না, তা নির্ধারণ করতে হবে।
- **নিরাপদ আশ্রয়স্থল নির্ধারণ:** স্কুলের ভিতরে ও বাইরে নিরাপদ আশ্রয়স্থল চিহ্নিত করতে হবে, যেখানে শিক্ষার্থীরা নিরাপদে থাকতে পারবে।
- **সাজসজ্জা ও উপকরণ প্রস্তুতি:** সুনির্দিষ্ট ম্যানুয়াল, সংকেত এবং জরুরি সরঞ্জাম যেমন- পানির ব্যবস্থা, ফার্স্ট এইড কিট, এবং সোলার লাইট প্রস্তুত রাখতে হবে।

ইভাকুয়েশন পরিকল্পনা:

- **ইভাকুয়েশন রুট ও পদ্ধতি:** স্কুলের ইভাকুয়েশন রুট স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করতে হবে। শিক্ষার্থীদের দ্রুত বের হতে সহায়ক সিগন্যাল ও নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।
- **দুর্বল শিক্ষক-শিক্ষার্থীর জন্য ব্যবস্থা:** শিশু, বয়স্ক শিক্ষক বা শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- **নিরাপদ আশ্রয়ে স্থানান্তর:** দুর্যোগের আগেই নির্ধারিত আশ্রয়স্থলে শিক্ষার্থীদের ও শিক্ষকদের নিয়ে চলে যাওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এটি হতে পারে স্কুলের পছন্দের একটি উঁচু জায়গা বা আশেপাশের একটি নিরাপদ স্থান।
- **মোবাইল ফোন ও যোগাযোগের ব্যবস্থা:** সকল শিক্ষক ও কর্মচারীর কাছে মোবাইল ফোন থাকতে হবে এবং জরুরি যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রস্তুত রাখতে হবে।

অনুশীলন ও শিক্ষাদান:

- **ইভাকুয়েশন মহড়া:** দুর্যোগের প্রাথমিক চিহ্ন পেলে কীভাবে দ্রুত ইভাকুয়েশন করতে হবে, তার জন্য নিয়মিত মহড়া পরিচালনা করতে হবে।
- **শিক্ষার্থীদের সচেতনতা:** শিক্ষার্থীদের বন্যা বা ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে সচেতন করতে হবে, যেন তারা বিপদের সংকেত ও প্রাথমিক প্রতিরোধের ব্যবস্থা কী হতে পারে সেটা বুঝতে পারে।

বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের সময় প্রস্তুতি:

- **বন্যা:** বন্যার পূর্বাভাস থাকলে স্কুলে অতিরিক্ত পানির সরবরাহ, স্যানিটেশন ব্যবস্থা এবং মেডিকেল কিট প্রস্তুত রাখতে হবে। পানির স্তর বেড়ে গেলে শিক্ষার্থীদের দূরে সরিয়ে রাখতে হবে।
- **ঘূর্ণিঝড়:** ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাসে সবাইকে অবিলম্বে সুরক্ষিত আশ্রয়ে নিয়ে যেতে হবে। স্কুলে বিদ্যুৎ না থাকলে প্রাকৃতিক আলো বা জরুরি লাইট ব্যবহার করতে হবে।

রেকর্ড ও পুনরুদ্ধার:

- **রেকর্ড সংরক্ষণ:** ইভাকুয়েশন পরিকল্পনা এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী রিপোর্ট সংরক্ষণ করতে হবে যেন পরবর্তী সময়ে পরিস্থিতির মূল্যায়ন করা যায়।
- **পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা:** দুর্গত এলাকাগুলো পুনরুদ্ধারে কীভাবে সহায়তা করা হবে, তা নির্ধারণ করতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে।

বিকল্প যোগাযোগ ব্যবস্থা:

যোগাযোগের বিকল্প ব্যবস্থা: বিদ্যুৎ, ফোনের নেটওয়ার্ক বা ইন্টারনেট নাও থাকতে পারে, তাই বিকল্প যোগাযোগ ব্যবস্থা যেমন- রেডিও বা স্যাটেলাইট ফোন বা হ্যান্ড মাইক ব্যবহার করা যেতে পারে। এভাবে, একটি স্কুলের বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় প্রতিরোধ এবং ইভাকুয়েশন পরিকল্পনা শিক্ষার্থীদের এবং স্কুল কর্মীদের সহনক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সহায়ক হবে।

১০. শিক্ষায় জলবায়ু সহনক্ষমতা এবং অভিযোজনের জন্য অভিভাবক-সামাজিক কমিউনিটির ভূমিকা:

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় বিদ্যালয় ও শিক্ষার্থীদের ভূমিকাকে শক্তিশালী করার জন্য অভিভাবক ও সামাজিক কমিউনিটির সক্রিয় অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশকে টেকসই এবং জলবায়ু সহনশীল করে তোলার ক্ষেত্রে এই দুটি গোষ্ঠীর সমন্বিত প্রচেষ্টার উপর শিক্ষার মান এবং অভিযোজন ক্ষমতা বহুলাংশে নির্ভরশীল। নিচে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হলো:

ক. খাপ খাইয়ে নেওয়ার সক্ষমতা বৃদ্ধি (Resilience Building):

অভিভাবক এবং কমিউনিটি তাদের সম্পৃক্ততায় স্কুলগুলোকে জলবায়ু-সহনশীল প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরে সহায়তা করতে পারে।

খ. শিক্ষার প্রসার (Knowledge Management):

অভিভাবকদের ভূমিকা:

- স্থানীয় সমস্যার আলোকে শিক্ষার্থী, অভিভাক, শিক্ষক এবং বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে ক্লাইমেট অ্যাকশন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ;

কমিউনিটির ভূমিকা:

- স্থানীয় বিদ্যালয়ে পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতা কর্মশালা আয়োজন করা ও
- বিদ্যালয়ে জলবায়ু সহনক্ষমতা বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

গ. পরিকাঠামো উন্নয়ন (Infrastructure Development):

- সামাজিক কমিউনিটির সহায়তায় সবুজ ক্যাম্পাস নিমার্ণের লক্ষে স্কুলগুলোতে **সোলার প্যানেল** স্থাপন ও পরিবেশবান্ধব শৌচাগার নির্মাণে ভূমিকা রাখা এবং
- উপকূলীয় অঞ্চলে **রেইনওয়াটার হার্ভেস্টিং সিস্টেম** স্থাপনে সহায়তা করা;

ঘ. দুর্যোগ প্রস্তুতি (Risk Reduction):

অভিভাবক এবং স্থানীয় সমাজের সদস্যরা স্কুলভিত্তিক বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রস্তুতি কার্যক্রমে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা;

- স্কুলের ইমার্জেন্সি ড্রিল ও পূর্বসতর্কতা প্রক্রিয়ায় অভিভাবকদের যুক্ত করা ও
- কমিউনিটি ওয়ার্ড বা ইউনিয়ন ভিত্তিক দুর্যোগ প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা।

১১. জলবায়ু পরিবর্তনে মানসিক স্বাস্থ্যের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় সহনক্ষমতা বৃদ্ধির নির্দেশিকাসমূহ

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আমাদের সমাজে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ ও সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে যা মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যা তৈরি করছে। সমস্যাগুলির মধ্যে রয়েছে হতাশা, উদ্বিগ্নতা, বিষন্নতা, ঘুমের সমস্যা, মানসিক চাপ, এবং আত্মহত্যার উপসর্গসমূহ। এই পরিবর্তনগুলির মুখোমুখি হতে এবং এগুলির সাথে মানিয়ে চলার জন্য মানসিক সহনক্ষমতা বৃদ্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের মানসিক সহনক্ষমতা বৃদ্ধির নির্দেশিকা নিম্নে দেয়া হলো:

i. শিক্ষকদের জন্য:

প্রশিক্ষণ: জলবায়ু পরিবর্তনের মনস্তাত্বিক প্রভাব এবং সহনক্ষমতা বৃদ্ধি কীভাবে করা যায় তার উপর প্রশিক্ষণ প্রদানকরা।

ক. প্রাথমিক মানসিক সহায়তা / Psychological First Aid (PFA) **দ্বারা তাৎক্ষণিক মানসিক সহায়তা:**

প্রাথমিক মানসিক সহায়তা বা সাইকোলজিক্যাল ফার্স্ট এইড বা পিএফএ হলো কেউ যখন হঠাৎ খুব বড় একটা বিপর্যয় বা চাপমূলক পরিস্থিতির শিকার হয় তখন তিনি খুব দ্রুত আশেপাশের মানুষের কাছ থেকে যে মানবিক,

সহযোগিতামূলক ও বাস্তব সহায়তা পায় এবং যা তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় আসতে সহায়তা করে। যেমন: যেকোন দুর্যোগপূর্ণ ঘটনা ঘটার পর ভুক্তভোগীকে প্রাথমিক পর্যায়ে কোনো উপকরণ ছাড়া কথার মাধ্যমে যে সহায়তা করা হয়। যা শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের প্রাথমিক ও তাৎক্ষণিক মানসিক চাপ হ্রাস করতে সাহায্য করে।

মূল উপাদানসমূহ:

নিরাপত্তা নিশ্চিত করা:

- শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের আশ্বস্ত করা যে তারা নিরাপদ এবং
- জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত এবং নির্ভুল তথ্য সরবরাহ করা ।

মানসিক প্রশান্তি আনা:

- মানসিক আঘাতপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সাথে সহানুভূতিশীল যোগাযোগ এবং
- ধীরে ধীরে তাদের সঙ্গে কথা বলে মানসিক চাপ কমানোর চেষ্টা করা।

আবশ্যকীয় প্রয়োজন চিহ্নিত করা:

- শিক্ষার্থীদের খাবার, পানীয় ও নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা বোঝা এবং
- যদি তারা মানসিক আঘাতপ্রাপ্ত হয়, তাদেরকে যথাযথ পেশাদারদের মাধ্যমে সহায়তা নিতে উৎসাহিত করা ।

খ. মনোসামাজিক সহায়তার / Psychosocial Support (PSS) মাধ্যমে মানসিক সহায়তা

মনোসামাজিক সহায়তা হল এমন এক ধরনের উপায় বা সহযোগিতা যা কিনা আকস্মিক বিপর্যয়, বিপত্তি, উৎপীড়ন বা নিপীড়নের ফলে সৃষ্ট মানসিক বিপত্তি থেকে শিক্ষার্থী, ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে মানসিকভাবে শক্তিশালী করে তাদের জীবনযাত্রায় স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করে ।

মূল উপাদানসমূহ:

➢ **বিশ্বাসের সম্পর্ক গঠন:**

- শিক্ষার্থীদের সাথে উষ্ণ ও সংবেদনশীল আচরণ করা এবং ইতিবাচক যোগাযোগ বাড়ানোর মাধ্যমে তাদের নিরাপদ অনুভব করানো এবং
- অভিভাবকদের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করে পরিবারে মানসিক স্থিতি আনার চেষ্টা করা ।

➢ **মানসিক স্থিতিশীলতার চর্চা:**

- শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ইতিবাচক কথোপকথন এবং
- মানসিক চাপ মোকাবেলায় শ্বাস-প্রশ্বাস ব্যায়াম এবং মেডিটেশন শেখানো ।

➢ **আশা এবং ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি**

- ব্যাক্তির মানসিক শক্তি ও সক্ষমতার ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করে ভবিষ্যতের জন্য আশার সঞ্চার করা এবং
- ব্যক্তিগত এবং কমিউনিটির জন্য বাস্তবসম্মত লক্ষ্য এবং প্রত্যাশা নির্ধারণে সহায়তা করা ।

➢ **সহযোগিতা প্রদানের ব্যবস্থা করা:**

- পেশাদার মানসিক স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ও প্রয়োজন অনুসারে রেফার করা এবং
- মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধিতে কর্মশালা আয়োজন ।

গ. শিক্ষকদের দৈনন্দিন মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনার কৌশল আয়ত্তত্ব করা ও নিয়মিত আত্মপরিচর্যা অনুশীলন করা

শিক্ষকদের মানসিক সুস্থতা বজায় রাখা এবং তাদের শিক্ষার্থীদের কার্যকরভাবে সহায়তা করার জন্য শিক্ষকদের চাপ মোকাবেলা এবং আত্মপরিচর্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চাপ মোকাবেলার জন্য চাপের কারণগুলো চিহ্নিত করা, গভীর শ্বাস নেওয়া বা মাইন্ডফুলনেসের মতো রিলাক্সেশন কৌশল অনুশীলন করা এবং ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনের মধ্যে একটি ভারসাম্য তৈরি করা প্রয়োজন। শিক্ষকেরা বাস্তবসম্মত প্রত্যাশা নির্ধারণ, কাজের অগ্রাধিকার নির্ধারণ এবং প্রয়োজন হলে সহকর্মী বা পেশাদার সাহায্য গ্রহণ থেকে উপকৃত হতে পারেন। আত্ম-পরিচর্যার মধ্যে রয়েছে নিয়মিত ব্যায়াম, সুষম খাদ্যাভ্যাস এবং পর্যাপ্ত ঘুমের মতো স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গ্রহণ, পাশাপাশি আনন্দ এবং বিনোদনমূলক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ। নিজেদের মানসিক স্বাস্থ্য চাহিদা পূরণ এবং আত্মসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শিক্ষকরা তাদের সহনক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের জন্য স্বাস্থ্যকর মানসিক কৌশলের উদাহরণ স্থাপন করতে পারেন।

ii. শিক্ষার্থীদের জন্য:

- **সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মশালা:** জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মানসিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব এবং কীভাবে মানসিক সহনক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায় তার উপর কর্মশালা আয়োজন করা ।
- **সাপোর্ট গ্রুপ তৈরি করা:** শিক্ষার্থীদের জন্য একটি সাপোর্ট গ্রুপ তৈরি করা, যেখানে তারা তাদের অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতাগুলি শেয়ার করতে পারবে ।
- **দলীয় কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা:** শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিবেশ-বান্ধব কার্যক্রম বা গ্রুপ ওয়ার্ক আয়োজন করা ও পরিবেশ রক্ষার কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় রাখা ।
- **মাইন্ডফুলনেস অনুশীলন:** মাইন্ডফুলনেস এবং মেডিটেশন কৌশল শিখানো, যা মানসিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে ।

iii. অভিভাবকদের জন্য:

- **অভিভাবক সভা:** জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মানসিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব এবং মানসিক সহনক্ষমতা সম্পর্কিত অভিভাবক সভা এবং আলোচনার ব্যবস্থা করা, যাতে তারা নিজেদের এবং পরিবারের জন্য মানসিক সহনক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারে ।
- **সহযোগিতা ও সংযোগ:** কমিউনিটির মানুষদের মধ্যে সহযোগিতা এবং সংযোগ বৃদ্ধি করা, যাতে তারা একে অপরের প্রতি সমর্থন দিতে পারে ।

- **পরিবেশগত কার্যক্রমে অভিভাবকদের সম্পৃক্ত করা:** অভিভাবকদের পরিবেশ বিষয়ক কার্যক্রমে যুক্ত করে মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করা । এছাড়াও "সবুজ কার্যক্রম" এবং "পরিবেশ ক্লাব" তৈরিতে অভিভাবকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা ।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বর্তমানে বিশ্বজুড়ে এক গভীর সংকট হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা, অপ্রত্যাশিত আবহাওয়াজনিত ঘটনা, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সংকট মানবজাতি ও পরিবেশের উপর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলছে। এই প্রেক্ষাপটে, জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া এবং সহনক্ষমতা গড়ে তোলার গুরুত্ব অপরিসীম। ম্যানুয়ালটিতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় টেকসই এবং বিজ্ঞানভিত্তিক কৌশল প্রণয়ন, স্থানীয় পর্যায়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বৈশ্বিক সহযোগিতার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সহনক্ষমতার ক্ষেত্রে ঝুঁকি মূল্যায়ন, অভিযোজনমূলক পদক্ষেপ এবং টেকসই উন্নয়ন কাঠামো তৈরি করার দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সকল অংশীজনের প্রচেষ্টা এবং সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমেই এই চ্যালেঞ্জগুলো সফলভাবে মোকাবেলা করা সম্ভব। ব্যক্তি, সমাজ এবং নীতিনির্ধারকদের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমেই একটি সুরক্ষিত ও টেকসই ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা যেতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন শুধু একটি চ্যালেঞ্জ নয়, এটি একটি সুযোগ, যেখানে আমরা উন্নত প্রযুক্তি, উদ্ভাবন এবং সামষ্টিক উদ্যোগের মাধ্যমে আরও সুষম ও সমৃদ্ধ পৃথিবী গড়ে তোলা সম্ভব।

সংযুক্তি-১

বিদ্যালয় নির্বাচন মানদন্ড:

মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সহনক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে লেইস প্রকল্পের আওতায় ৬০০টি বিদ্যালয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে **"বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০"** অনুসারে বাংলাদেশের **জলবায়ুজনিত ঝুঁকিপ্রবণ হটস্পট হিসেবে চিহ্নিত** অঞ্চলের ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত কৌশল ব্যবহার করা যেতে পারে:

অঞ্চল ও জেলার সংখ্যা	জেলা প্রতি বিদ্যালয় (অতিরিক্ত ঝুঁকি সম্পন্ন)	মোট বিদ্যালয়	বিদ্যালয় নির্বাচন কৌশল
উপকূলীয় অঞ্চল (১৯টি জেলা)	১০টি	১৯০ টি	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক বিদ্যালয় নির্বাচনের মানদন্ড নির্ধারণ করে জেলা/ উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার তথ্যের ভিত্তিতে বিদ্যালয় নির্বাচন করা হবে।
বরেন্দ্র এবং খরাপ্রবণ অঞ্চল (১৮টি জেলা)	৮টি	১৪৪টি	
হাওর এবং আকস্মিক প্লাবনপ্রবণ অঞ্চল (৭টি জেলা)	৭টি	৪৯টি	
পাহাড়ি এবং চট্টগ্রাম অঞ্চল (৩টি জেলা)	৬টি	১৮টি	
নদী অঞ্চল এবং মোহনা (২৯টি জেলা)	৬টি	১৭৪টি	
নগরাঞ্চল (৭টি জেলা)	৫টি	৩৫টি	
মোট		**৬১০টি**	

সংযুক্তি-২

বিদ্যালয়ে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব ও সহনক্ষমতার কার্যকারিতা পরিমাপের লক্ষ্যে পরীবিক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া:

বিদ্যালয়ে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সহনক্ষমতার কার্যকারিতা পরিমাপের জন্য একটি কাঠামোবদ্ধ প্রক্রিয়া প্রয়োজন, যা শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, আচরণ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশগত উন্নয়ন পর্যালোচনার মাধ্যমে সম্পন্ন করা যেতে পারে। এই প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত দপ্তরসমূহ নির্ধারিত কিছু পদক্ষেপের মাধ্যমে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের কাজ সম্পন্ন করতে পারে। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/কর্মকর্তা ও পদক্ষেপসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

চিত্র: শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জলবায়ু ঝুঁকি নিরসন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ বিষয়ক টেবিল

ক্রমিক	দপ্তর/অধিদপ্তরের নাম	কর্মকর্তার পদবী	দায়িত্ব
১.	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন/মাধ্যমিক উইং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)	পরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তা	জেলা শিক্ষা অফিসের মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক তদারকি; প্রয়োজনে দূর্যোগের জন্য ঝুঁকিপ্রবণ এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জলবায়ু সংক্রান্ত কার্যক্রম সরাসরি তদারকি।
২.	আঞ্চলিক উপপরিচালকের কার্যালয়	উপপরিচালক (মাধ্যমিক) ও অন্যান্য কর্মকর্তা	জেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক তদারকি; দূর্যোগের জন্য ঝুঁকিপ্রবণ এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জলবায়ু সংক্রান্ত কার্যক্রম সরাসরি তদারকি।
৩.	জেলা শিক্ষা অফিস	জেলা শিক্ষা অফিসার ও অন্যান্য কর্মকর্তা	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক তদারকি; জেলার বিদ্যালয়গুলোর বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে সাথে জলবায়ু সংক্রান্ত কার্যক্রম সরাসরি পর্যবেক্ষণ;
৪.	উপজেলা শিক্ষা অফিস	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ও	উপজেলা পর্যায়ে বিদ্যালয়গুলোর জলবায়ু সংক্রান্ত কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন।

ক্রমিক	দপ্তর/অধিদপ্তরের নাম	কর্মকর্তার পদবী	দায়িত্ব
		একাডেমিক সুপারভাইজার	
৫.	এসএমসি/এমএমসি	সভাপতি	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জলবায়ু ঝুঁকি নিরসন ও সহনক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কার্যক্রম তদারকি ও সমস্যা সমাধানে প্রধান শিক্ষককে সহযোগিতা প্রদান।
৬.	বিদ্যালয়/মাদ্রাসা	প্রতিষ্ঠান প্রধান	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জলবায়ু ঝুঁকি নিরসন ও সহনক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জলবায়ু ঝুঁকি নিরসন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ বিষয়ক ফ্লো চার্ট

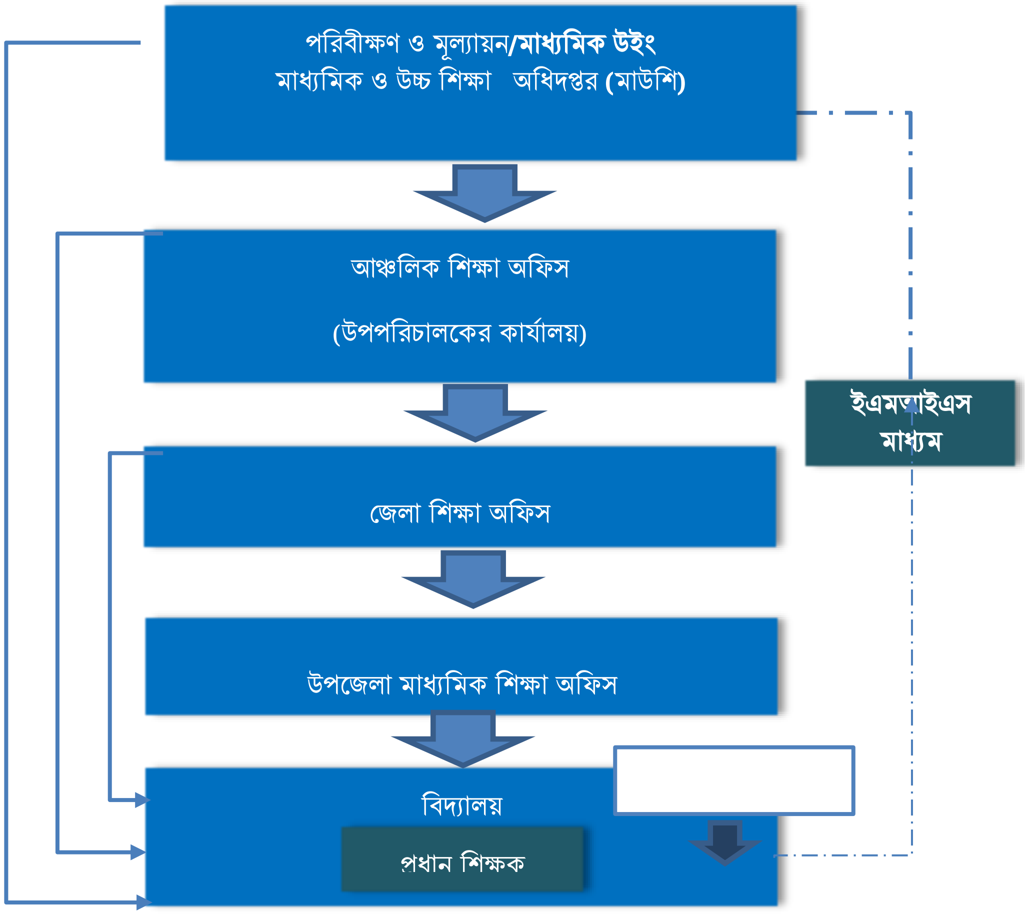

লক্ষ্য ও সূচক নির্ধারণ

লক্ষ্য নির্ধারণ:

জলবায়ুর প্রভাবজনিত সমস্যা মোকাবেলা ও সহনক্ষমতার কার্যক্রম পরীবিক্ষণের নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত লক্ষ্য নির্ধারণ করা যেতে পারে:

- ○ শিক্ষার্থীদের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি।
- ○ পরিবেশবান্ধব আচরণ।
- ○ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোতে টেকসই পরিবর্তন আনা।

সূচক নির্ধারণ:

নিম্নবর্ণিত পরিমাপযোগ্য সূচক প্রস্তুতপূর্বক মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু করা যেতে পারে:

- ○ **সচেতনতা:** শিক্ষার্থীদের কত শতাংশ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান কারণ ও প্রভাব বুঝতে সক্ষম।
- ○ **আচরণগত পরিবর্তন:** কতজন শিক্ষার্থী বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বা পুনর্ব্যবহারের অংশগ্রহণ করছে।
- ○ **পরিবেশগত উন্নয়ন:** শক্তি ও পানির ব্যবহার কতটা কমেছে।

প্রাথমিক মূল্যায়ন

বিদ্যালয়ে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব ও সহনক্ষমতার কার্যকারিতা পরিমাপের লক্ষ্যে ম্যানুয়াল অনুসারে কার্যক্রম গ্রহণের পূর্বে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীর পরিস্থিতি কেমন ছিলো সে সম্পর্কে নিম্নবর্ণিত ধারণাসমূহ নেওয়া প্রয়োজন (প্রাক মূল্যায়ন), তাহলে মূল্যায়ন যথাযথ হবে:

- শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও সচেতনতার স্তর।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশগত অবস্থা (যেমন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পানি ও শক্তি ব্যবহার)।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জলবায়ু ঝুঁকি (যেমন বন্যা, ঘুর্ণিঝড় বা তাপপ্রবাহ)।

পর্যবেক্ষণ এবং তথ্য সংগ্রহ

তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি:

- ○ শিক্ষার্থী ও কর্মীদের জন্য জরিপ ও কুইজ।
- ○ আচরণ পর্যবেক্ষণ (যেমন রিসাইক্লিং বিনের ব্যবহার)।

○ পরিবেশগত ডেটা (শক্তি ও পানির ব্যবহার, বর্জ্য উৎপাদন)।

নিয়মিত পর্যবেক্ষণ:

○ নির্দিষ্ট সময় অন্তর (যেমন মাসিক, ত্রৈমাসিক) তথ্য সংগ্রহ।
○ প্রতিটি উদ্যোগের কার্যকারিতা পর্যালোচনা।

অংশীজনদের সম্পৃক্তকরণ

- শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের মতামত সংগ্রহ।
- ফোকাস গ্রুপ আলোচনা বা ওয়ার্কশপের আয়োজন।
- পরিবেশভিত্তিক স্টুডেন্ট ক্লাব তৈরি করে তাদেরকে মূল্যায়নের কাজে অংশগ্রহণ করানো।

কার্যকারিতা পরিমাপের সূচক (Performance Metrics)

- **জ্ঞান বৃদ্ধি:** শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রি ও পোস্ট-মূল্যায়ন স্কোরের তুলনা।
- **আচরণগত পরিবর্তন:** পরিবেশবান্ধব কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের হার।
- **পরিবেশগত প্রভাব:**

○ শক্তি ও পানির ব্যবহার হ্রাস।

○ বৃক্ষরোপন ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণ, ইত্যাদি।

গুণগত বিশ্লেষণ (Qualitative Analysis)

- সাফল্যের গল্প বা প্রকল্প থেকে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা নথিভুক্ত করতে হবে।
- সাক্ষাৎকার এবং মন্তব্যের মাধ্যমে মনোভাব ও আচরণের পরিবর্তন লিপিবদ্ধ করতে হবে।

বাহ্যিক মূল্যায়ন

- নিরপেক্ষ মূল্যায়নের জন্য পরিবেশ বিশেষজ্ঞ বা সংশ্লিষ্ট সংস্থার সহায়তা নেওয়া যেতে পারে।
- অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একই ধরনের উদ্যোগের সঙ্গে তুলনা করে ফলাফল বিশ্লেষণ করতে হবে।

প্রতিবেদন ও যোগাযোগ

- নিয়মিত প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে, যেখানে থাকবে:

- ○ দুর্যোগ মোকাবেলা সংক্রান্ত কাজের অগ্রগতি।
- ○ কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ এবং সমাধানের পদ্ধতি।
- ○ সাফল্যের গল্প এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ।
- শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে প্রতিবেদন শেয়ার করা যেতে পারে।

প্রতিক্রিয়া ও উন্নয়ন

- কার্যক্রমের ফলাফলের ভিত্তিতে কৌশল পুনর্নির্ধারণ করতে হবে।
- সফল উদ্যোগগুলিকে সম্প্রসারিত করে প্রয়োজনে নতুন কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব পর্যালোচনা

- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভিযোজন ক্ষমতা মূল্যায়ন করতে হবে এবং
- প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের জলবায়ু কার্যক্রমে সম্পৃক্ততা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সহনক্ষমতা উদ্যোগগুলির কার্যকারিতা সঠিকভাবে পরিমাপ করা সম্ভব, যা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীলতা এবং ক্রমাগত উন্নয়ন নিশ্চিত করবে।

ম্যানুয়ালে ব্যবহৃত জলবায়ু সংক্রান্ত প্রযুক্তিগত পরিভাষা

ক. তাপীয় দ্বীপ (Heat Island): ‘‘তাপীয় দ্বীপ’’ বা "Heat Island" হলো একটি পরিবেশগত ধারণা, যা দ্বারা একটি শহর বা নগর অঞ্চলের তাপমাত্রা সেই এলাকার চারপাশের গ্রামাঞ্চল বা প্রাকৃতিক পরিবেশের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি হওয়া বোঝায়। এটি প্রধানত শহরাঞ্চলের কংক্রিট, অ্যাসফাল্ট, সিমেন্ট এবং অন্যান্য তাপ ধারণকারী উপকরণের কারণে ঘটে, যা সূর্যের তাপ শোষণ করে এবং রাতের সময়ও তা ধীরে ধীরে ছেড়ে দেয়। এর ফলে শহরের তাপমাত্রা আশপাশের গ্রামীণ এলাকাগুলোর তুলনায় বেশি থাকে, যা "হিট আইল্যান্ড এফেক্ট" নামে পরিচিত।

খ. 3 Zero Club: "3 Zero Club" হল একটি গ্লোবাল উদ্যোগ, যা ৩টি লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমে বিশ্বের জন্য একটি স্থিতিশীল এবং সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ নির্মাণে সহায়তা করার লক্ষ্যে কাজ করছে। এই তিনটি লক্ষ্য হলো:

শূন্য দারিদ্র্য (Zero Poverty): এটি মানুষের জীবনমান উন্নত করার উদ্দেশ্যে দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রচেষ্টা। এর মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, বাসস্থান এবং আয়ের সুযোগ বৃদ্ধি করার মাধ্যমে দারিদ্র্য কমানোর কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত।

শূন্য ক্ষুধা (Zero Hunger): পৃথিবীজুড়ে খাদ্য নিরাপত্তা এবং পুষ্টির সুষম বণ্টন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই উদ্যোগ খাদ্য অভাব দূর করার জন্য কৃষি, খাদ্য উৎপাদন এবং বিতরণের ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তি ও সমাধানগুলোকে সমর্থন করে।

শূন্য কার্বন নিঃসরণ (Zero Carbon Emissions): এর লক্ষ্য হলো জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার জন্য গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ শূন্যে আনা। এই লক্ষ্যটি বিভিন্ন শিল্প, পরিবহন, শক্তি উৎপাদন ইত্যাদির মাধ্যমে কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমানোর উদ্যোগ গ্রহণের উপর গুরুত্ব দেয়।

গ. শূন্য নিঃসরণ কার্যক্রম (Net Zero Emission Activity): এটি এমন পদক্ষেপ বা উদ্যোগ যা কার্বন ডাই অক্সাইড (CO_2) এবং অন্যান্য গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের পরিমাণ শূন্যে নামানোর লক্ষ্যে

গ্রহণ করা হয়। এর মাধ্যমে পৃথিবীর গ্লোবাল উষ্ণতা বৃদ্ধির হার কমানো এবং জলবায়ু পরিবর্তনকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়।

ঘ. Climate Forcing: Climate Forcing হল এমন এক প্রক্রিয়া, যা পৃথিবীর জলবায়ু বা জলবায়ুর পরিবর্তনকে প্রভাবিত করে। এটি জলবায়ু সিস্টেমে শক্তি বা প্রভাবের পরিমাণকে নির্দেশ করে যা পৃথিবীর তাপমাত্রা এবং আবহাওয়াকে পরিবর্তন করতে পারে।

ঙ. অভিযোজন:

অভিযোজন (Adaptation) হলো একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে মানুষ, জীবজন্তু এবং পরিবেশ তাদের পরিবেশগত, জলবায়ু বা অন্যান্য পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে সক্ষম হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে, **অভিযোজন** এমন পদক্ষেপ বা কৌশল যা মানুষের বা প্রাকৃতিক সিস্টেমের ক্ষতি কমাতে এবং তাদের প্রভাবের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য গ্রহণ করা হয়।

চ. সবুজ বিদ্যালয় (Green Schooling): "সবুজ বিদ্যালয় ব্যবস্থা" এমন একটি শিক্ষার পদ্ধতি বা ধারণা, যেখানে পরিবেশ সংরক্ষণ, প্রাকৃতিক সম্পদের সুরক্ষা এবং টেকসই উন্নয়নকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থায় স্কুলগুলো পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়, যেমন:

১. **প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক ব্যবহার:** স্কুলে পানি, বিদ্যুৎ এবং অন্যান্য সম্পদের অপচয় কমানো এবং নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যববহার

২. **পুনর্ব্যবহার ও পুনঃচক্রণ:** বর্জ্য সঠিকভাবে পুনর্ব্যবহার ও রিসাইক্লিং করা।

৩. **সবুজ পরিবেশ তৈরি:** শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আঙিনা এবং পরিবেশে গাছপালা লাগানো এবং সবুজ পরিবেশ সৃষ্টি করা।

৪. **পরিবেশ সচেতনতা:** শিক্ষার্থীদের পরিবেশ রক্ষার গুরুত্ব ও টেকসই উন্নয়নের উপর সচেতন করা।

সবুজ বিদ্যালয় ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আরও বেশি অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে এবং ভবিষ্যতে পরিবেশবান্ধব জীবনযাপন শেখায়।

ছ. ইকো ক্লাব: **ইকো ক্লাব** (Eco Club) একটি পরিবেশ সুরক্ষা সংক্রান্ত ছাত্র সংগঠন, যা সাধারণত স্কুল বা কলেজ পর্যায়ে গঠিত হয়। এর মূল লক্ষ্য হলো পরিবেশ রক্ষা, প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ এবং টেকসই উন্নয়ন বিষয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা। ইকো ক্লাবের কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে:

১. **বৃক্ষরোপণ:** গাছপালা রোপণ করা এবং তাদের সঠিক পরিচর্যা করা, যাতে সবুজ পরিবেশ তৈরি হয়।

২. **পরিবেশ সচেতনতা সৃষ্টি**: শিক্ষার্থীদের পরিবেশের প্রতি দায়িত্বশীলতা এবং সচেতনতা তৈরি করার জন্য সেমিনার, কর্মশালা, বিতর্ক ইত্যাদির আয়োজন করা।

৩. **বর্জ্য ব্যবস্থাপনা:** বর্জ্য পুনঃব্যবহার, পুনঃচক্রণ এবং কমিয়ে ফেলার কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৪. **পানির সাশ্রয়:** পানির অপচয় রোধে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং পানি সংরক্ষণ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

৫. **পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ**: প্লাস্টিক ব্যবহারের বিরুদ্ধে আন্দোলন, বায়ু এবং জল দূষণ কমানোর জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া।

ইকো ক্লাব শিক্ষার্থীদের পরিবেশ রক্ষায় আগ্রহী করে তোলে এবং তাদের সঠিক পরিবেশবান্ধব আচরণ গড়ে তোলার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। এর মাধ্যমে স্কুল বা কলেজ ক্যাম্পাসে একটি সবুজ ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়।

জ. সেফটি ড্রিল (Safety Drill): সেফটি ড্রিল (Safety Drill) বলতে এখানে বুঝানো হয়েছে একটি অনুশীলন বা মহড়া, যা সাধারণত শিক্ষার্থীদের ও স্কুলের স্টাফদেরকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষেত্রে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করে। এই মহড়ার উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের এবং স্কুলের কর্মীদের নিরাপদ থাকার জন্য প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা এবং তাদেরকে শান্তভাবে এবং সঠিকভাবে বিপদ মোকাবেলা করার দক্ষতা অর্জন করতে সহায়তা করা।

প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন সেফটি ড্রিলের অন্তর্ভুক্ত কিছু সাধারণ ধাপ নিম্নে দেওয়া হলো:

ইভাকুয়েশন ড্রিল: এটি একটি মহড়া, যেখানে শিক্ষার্থীদের দ্রুত স্কুল বা স্কুলের একটি নির্দিষ্ট এলাকা ত্যাগ করতে বলা হয়, সাধারণত ভূমিকম্প, অগ্নিকান্ড বা অন্য কোনো বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য।

প্রথম সহায়তা ড্রিল: এটি এমন একটি মহড়া, যেখানে শিক্ষার্থীদের শেখানো হয় কীভাবে সাধারণ আঘাত বা অসুস্থতার সময় দ্রুত প্রথম সহায়তা দেওয়া যেতে পারে।

বন্যা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মহড়া: এটি বন্যা বা অন্য কোনো প্রাকৃতিক বিপদ থেকে রক্ষার জন্য কীভাবে সুরক্ষিত স্থানে চলে যেতে হবে, সেজন্য প্রস্তুতি নেওয়া হয়।

সেফটি ড্রিলের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা এবং স্কুলের কর্মীরা এসব পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকে এবং তারা জানে কীভাবে স্বস্তি ও শান্তভাবে বিপজ্জনক মুহূর্তগুলো মোকাবেলা করতে হবে। এটি স্কুলের নিরাপত্তা ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

ঝ. "ড্রপ, কভার, এবং হোল্ড অন" কৌশল

ভূমিকম্পের সময় ব্যক্তিগত সুরক্ষার জন্য এটি একটি কার্যকর এবং সহজ কৌশল। এটি দ্রুত পদক্ষেপ নিতে সাহায্য করে এবং চোট পাওয়ার ঝুঁকি কমায়। নিচে এই কৌশলটির ধাপগুলো দেওয়া হলো:

১. ড্রপ (Drop):

- প্রথমে মাটিতে বসে পড়তে হবে।
- দাঁড়িয়ে থাকলে বা দৌড়ানোর চেষ্টা করলে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি, যা আহত করতে পারে।
- সুরক্ষিত অবস্থানে চলে যাওয়া জরুরি।

২. কভার (Cover):

- নিকটস্থ কোনো শক্তিশালী আসবাব, যেমন একটি টেবিল বা ডেস্কের নিচে আশ্রয় নিতে হবে।
- টেবিল না থাকলে, হাত দিয়ে মাথা ও ঘাড় ঢেকে দেয়ার চেষ্টা করতে হবে এবং দেয়ালের কাছাকাছি অবস্থান করতে হবে।
- জানালা বা ভারী আসবাবপত্র থেকে দূরে থাকতে হবে, কারণ এগুলো বিপজ্জনক হতে পারে।

৩. হোল্ড অন (Hold On):

- কোনা শক্ত জিনিস (যেমন টেবিল) শক্ত করে ধরে রাখতে হবে।
- ভূমিকম্প চলাকালীন আসবাব নড়ে গেলে তার সঙ্গে ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করতে হবে।
- আশ্রয় না পেলে, দুই হাত দিয়ে মাথা এবং ঘাড় সুরক্ষিত রেখে যতক্ষণ না কম্পন থামে ততক্ষণ মাটিতে থাকতে হবে।